আত্ম-সাধনা

শ্রীগুরুকান্ত ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
৪৮।১নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য দশ আনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীগুরুজী মহারাজ !
সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক
তোমার শ্রীশ্রীচরণকমলেষু
আমার এই "আত্ম-সাধনাকে"
অর্পণ করিলাম ।

ভূমিকা

মনুষ্যজন্ম (বিশেষতঃ ভারতে জন্ম) অতি দুর্ল্লভ জন্ম। এই জন্ম বহু তপস্যার ফলে লাভ হয়। যিনি এই জন্ম লাভ করিয়া শ্রীভগবানকে পাইতে ইচ্ছা না করেন তাঁহার জন্মই বৃথা !

পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীভগবান্ বহু হইয়া খেলিবার ইচ্ছা করিয়া বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ঘটে ঘটে একরূপেই বিরাজমান আছেন। আমাতেও যেরূপ আছেন তোমাতেও সেইরূপেই আছেন। কাহাকেও অবহেলা করিবার কোন বিষয় নাই।

বিভিন্নত্ব কেবল এই শরীর লইয়া। যার যার শরীর তাহাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই শরীর সেই অংশীর মন্দিরস্বরূপ। সেই অংশীর অংশ (যাহাকে চিত্ত, আত্মা, জীবাত্মা বা দেহী বলা হয়) এই মন্দিরে হৃদয় স্থলে বাস করিতেছেন। **পরমজ্যোতিতে মিশিয়া যাওয়াই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য**। এই শরীরকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনাশ করার নামই আত্মহত্যা ! অতএব অতি সন্তর্পণে এই মন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। এই শরীর-সম্বন্ধে শৌচাচার অতীব প্রয়োজনীয়। হৃদয়স্থ আত্মা আহারের দ্বারাই শুদ্ধ থাকেন। আহারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও শৌচাচার দ্বারা

দেহশুদ্ধি করিয়া সাধন অবলম্বনে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

পরিদৃশ্যমান্ জগৎ দুই প্রকারে বিভক্ত, যথা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। পরমাত্মা, জীবাত্মা, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ভাগে এবং পাঞ্চভৌতিক দেহ আধিভৌতিক ভাগে পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিক জগৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থ (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না) ; কেবল আধিভৌতিক জগৎই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। অতীন্দ্রিয় পদার্থগুলিকে তর্কের দ্বারা জানা যায় না, কেবল সাধন অবলম্বনে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা জানা যায়। আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া কোন তর্কই চলিতে পারে না।

মনুষ্যত্বের বিকাশ

আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয় এই কয়টিই পশু ও মনুষ্যের মধ্যে সমান। আহার ও বিহারে সংযমই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। **ইন্দ্রিয়-সংযমই মনুষ্যত্বের প্রথম সোপান। লজ্জাই ইন্দ্রিয়-সংযমের ভূষণ।**

পশুগুলি অনায়াসেই সর্ব্বসমক্ষে মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদন করে। পৃথিবীতে অনেক মনুষ্যাকৃতিযুক্ত জীবও রাস্তায় এবং সভাসদরে স্ত্রীলোক লইয়া টানাটানি করিতে দেখা যায়। ইহারা কিরূপে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

আমরা এখন অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছি। উলঙ্গ ছবি দেখিয়া এখন আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি। আর কত দিন পরে এই শিক্ষার গুণে আমরাও স্ত্রীলোক লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া টানাটানি করিতে আরম্ভ করিব। বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া দূরে থাকুক আমরা ক্রমশঃ পশুত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং লজ্জা সম্ভ্রম প্রভৃতি সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছি।

পশুগুলি যেখানে বাস করে সেই জায়গায়ই মলমূত্র পরিত্যাগ করে। কলিকাতার চীনাপাড়ায় গেলে মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদ নাই বলিয়াই বোধ হয়। পাহাড়নিবাসী অসভ্য জাতিরাও এইরূপই স্বভাবাপন্ন।

পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ভারতেই ছিল ; সেই ভারতই শিক্ষার গুণে পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কোন পুরুষ কোন মেয়েমানুষের পেছনে পেছনে ছুটিয়াছিল এই নিয়াই উপন্যাস লিখিত হয়। এইরূপ উপন্যাস এখন ঘরে ঘরেই পঠিত হইতেছে। ইহার ফলে আমরা ঔপন্যাসিক সাজিয়াছি। উপন্যাসগুলিও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি করিতেছে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-সংযম, দ্বিতীয়তঃ দেহাত্মবুদ্ধির বিনাশ, তৃতীয়তঃ আত্মদর্শন এবং চতুর্থতঃ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলিকাতা
১৫ই আষাঢ়
১৩২৮ বাং

গ্রন্থকার

সতর্কীকরণ

শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়। বেদের এক একটী বাক্য সত্যমূলক। সেই সত্যকে তর্কদ্বারা খণ্ডন করা যায় না।

প্রধানতঃ বেদ দুইভাগে বিভক্ত; কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যাগযজ্ঞাদি এই কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যজ্ঞের কর্ত্তাই হলেন আত্মদর্শী ঋষিগণ। আত্মদর্শী ঋষিগণ কলির প্রভাবে লুকাইয়া থাকিবেন তাই যজ্ঞেরও নিষেধ হইয়াছে। আমরা সকলেই এখন পশু হইতেও অধম হইয়াছি। **কাজেই পশু কি করিয়া পশুকে হনন করিয়া যজ্ঞের ফললাভ করিবেন?**

জ্ঞানকাণ্ডে তিন প্রকার ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। সেই তিন প্রকার ধর্ম্ম কি তাহা মৎপ্রণীত "স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক ধর্ম্মই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। এই ধর্ম্ম জানিতে হইলে ধ্যান, ধারণা ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। কিরূপে এই আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছান যায় তাহাই আমি এই গ্রন্থে বিবৃত করিব।

স্মৃতি, যথা পুরাণ, সংহিতাদি, বেদেরই অনুসরণ করিয়াছেন। স্মৃতি বেদের বাক্যগুলিকে সহজে বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

কিন্তু অধুনা পণ্ডিতমণ্ডলী তর্ক দ্বারা বেদের সত্যকে একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছেন। তর্কের অবস্থা শ্রীবেদব্যাস

বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১১শ সূত্রে সংস্থাপন করিয়াছেন। তর্কের কোন স্থিরতা নাই, অদ্য যিনি তর্কের দ্বারা অপরকে পরাভূত করিতেছেন, কল্য আবার তিনিই অপরের দ্বারা পরাজিত হইতেছেন; অতএব তর্কমূলে শ্রুতিমূলক সিদ্ধান্তের অপলাপ করা যায় না। যাঁহারা আত্মদর্শী হইবেন তাঁহারা বেদের সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেবল মুখের জোরে সত্যের অপলাপ করা যায় না। লোকে কথায়ও বলে যে তিনি যেন বেদবাক্য বলিতেছেন। কেবল শাস্ত্রে উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনেই আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। শ্রীবেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য করিতে গিয়া স্থানে স্থানে বলিয়াছেন যে, এই বিষয়গুলি লিখিয়া বুঝান যাইবে না, সত্য সত্যই এই অবস্থাগুলি আসে। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি; যথা, পাতঞ্জলদর্শনে সূত্র করা হইল "সূর্য্যসংযমে ভুবনজ্ঞানম্" (সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনের জ্ঞান উপজাত হয়)। বলি এই সূত্রটী আওড়াইলেই কি ভুবনের জ্ঞান হইয়া যাইবে? আমাদের পাণ্ডিত্য এখন কেবল সূত্র আওড়ানেতেই পর্য্যবসিত। কেহ কোন কাজ করিবেন না। পণ্ডিতগুলি তোতা পাখীর মত সূত্র মুখস্থ করিয়াই মহামহোপাধ্যায়, তর্কবাগীশ ও তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি উপাধিভূষণে ভূষিত হইতেছেন, আর লম্বা ফোঁটা কাটিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন। ইহাঁরাই আবার ধর্ম্মের ধ্বজারূপে অবস্থিত

আছেন। এই ধর্ম্মের ধ্বজাগুলি পতপত শব্দে উড়িতে না পারিয়া যষ্টিসংলগ্ন হইয়াই আছে। কেবল কি ধর্ম্মের দোহাই-তেই লোক ভুলিবে?

অধুনা সকলেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াই-তেছে। অমুক মন্ত্র জপ করিলে অমুক সিদ্ধি লাভ হয়। মন্ত্রজপ করিলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে চাহি না। এই স্থলে একটী দৃষ্টান্ত না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন একজন বাবুলোক একজন সাধু মহাপুরুষের নিকটে যাইয়া বলিলেন যে মহাশয়! আপনারা মন্ত্র দেন, সেই মন্ত্রে কি হয়? সাধু পুরুষটী উত্তর করিলেন "বাবুজি! কথার জোর কি কিছুই নাই? তোমাকে যদি এখন "শালা" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া গালি দেই তবে কি তোমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিবে না? তবে কেন বলিতেছ যে মন্ত্রের কোন জোর নাই?" গুরুদত্ত-মন্ত্রজপেই সিদ্ধিলাভ হয়। ঈশ্বরগীতায় শ্রীভগবান বলিয়া-ছেন "যজ্ঞানাং যপযজ্ঞোঽস্মি" (দশম অঃ ২৫শ্লোক); আমাদের প্রকৃত অবস্থাটী এই ঃ—আমরা কোন কাজ করিব না, কেবল ভিক্ষাংদেহি। কেবল ফাঁকির উপরে এই সংসার চলিতেছে না।

দেবগণ শ্রীভগবানের পার্ষদ। শ্রীভগবানের সৃষ্টি রক্ষার ভার এই দেবতাদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের সৃষ্টির চরমোৎকর্ষই দেবগণ। বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইত্যাদি দেবগণ মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করেন। ঈশ্বর গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

দেবতা।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান-প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেনএব সঃ ॥
(৩য় অঃ ১০-১২ শ্লোক)

অন্বয়ার্থ ঃ—পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা (প্রজাপতি) যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে (ঋষিগণকে) সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন "এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উন্নতিলাভ কর, ইহা দ্বারাই তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে ইষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি প্রদান করিবেন; ইষ্ট ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া যাঁহারা দেবতাদিগকে না দিয়া খাইবেন তাঁহারা চোর হইবেন।"

এখন বুঝুন আমরা দেবতাদিগকে অবমাননা করিয়া কত বড় চোর হইয়াছি। আমরা এখন সকলেই চোর। এই কলিকালে যজ্ঞ নিষেধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভোগ্যবস্তু (অর্থাৎ আমরা যাহা খাই) তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া দিয়া খাইতে কি আপত্তি হইতে পারে? দেবতা ভিন্ন যে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে

অনেকদিন যাবৎ বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্নই ছিল। ট্রামে চড়িয়া অনেক ভদ্রলোকই যাইতেছিলেন এবং বলাবলি করিতেছিলেন যে এরোপ্লেন দিয়া মেঘকে খুঁচিয়া দিলে কি বৃষ্টি হইবে না? এর মধ্যে অপর ভদ্রলোক বলিলেন কোথায় মহাশয়! এরোপ্লেন মেঘের ভিতর দিয়াই যায়, কিন্তু বৃষ্টি ত হয় না।

দেবতাদিগকে এখন আমরা অসুরের দলে ফেলিয়াছি। **আমরা এখন সকলেই ব্রহ্মটুপী মাথায় দিয়া চোর সাজিয়া ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি করিতেছি।**

এই দেবতাবিষয়ক আর এক প্রকারে আমাদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; যথা, উনি শাক্ত, উনি বৈষ্ণব, উনি শৈব ইত্যাদি। পুরাণ সংহিতাদি পাঠ করিলে ইহাই জানা যায় যে যখন যে দেবতার বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে সেই দেবতাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। **এই বিষয়ের মূলে একনিষ্ঠাই অন্তর্নিহিত আছে।** আমি যে দেবতাকে ভজনা করিব, তিনি কি এস্থানে আছেন, ঐ স্থানে নাই এরূপ চিন্তা করিতে হইবে? তিনি সর্ব্বব্যাপী এইরূপ চিন্তা করিয়াই তাঁহাকে ভজনা করিতে হইবে। "যে ঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥" (গীতা ৯ম অঃ ২৩শ শ্লোক) (যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতাকে পূজা করেন, তাঁহারা আমাকেই ভজনা করে, তবে তাহা অবিধি পূর্ব্বক করে)।

সমস্ত দেবতাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতেই ভজনা করিবে, ইহাই উপাসনার উৎকৃষ্ট বিধি। এই ভেদজ্ঞান আমাদের স্পষ্ট। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ভগবতীর আরাধনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন ; শ্রীরামচন্দ্র বিজয়লাভার্থে ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। একএক দেবতার একএকটী ভাগধেয় আছে। দক্ষযজ্ঞ করিতে গিয়া মহাদেবের ভাগ না দেওয়াতে তাঁহার যজ্ঞই পণ্ড হইয়া গেল।

এই বিষয় হইতে আর এক তর্ক পৌত্তলিকতা। আমরা দেহধারী হইয়াছি বলিয়া আমরা নিজেরাই যে পুতুল। আমরা পুতুল নিয়াই খেলা করিতেছি। পুতুলের চিন্তা ভিন্ন আমরা অন্য কোন চিন্তা করিতে পারি কি ? অচিন্ত্য অব্যক্তরূপের চিন্তা আত্মদর্শীগণই করিতে পারেন, কিন্তু দেহেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত আমরা কি সেই চিন্তা করিতে পারি ? যিনি আত্মদর্শী না হইয়া এই কথা বলেন তিনি বাতুল মাত্র।

শুধু গুরুর উপদিষ্ট কর্ম্ম করিতে করিতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে বহু আছে। উপনয়নের পর ১২ বৎসর গুরুগৃহে গিয়া থাকিতে হয়। গুরু শিষ্যের উপর কেবল গরু রাখিবার ভার দিলেন। যখন গুরু দেখিলেন যে শিষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে তখন গুরু প্রসন্ন হইয়া শিষ্যকে বর দিলেন "যাও বৎস! তোমাতে সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ প্রতিফলিত হইবে"। অমনি শিষ্য একজন জ্ঞানী পুরুষ হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লেখাপড়া তেমন

জানিতেন না, কিন্তু কেবলমাত্র গুরুর উপদেশে সাধন অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে সব বাক্য বলিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট বাক্য বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। **এখন আমরা কোন কার্য্য না করিয়া কেবল পাণ্ডিত্যের বালাই নিয়া মরিতে চাই।**

অমুক বড়, অমুক ছোট, অমুক ব্রাহ্মণ, অমুক শূদ্র ইত্যাদি বিষয় লইয়া মারামারি করিবার কি প্রয়োজন? যার যার নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই উচিত। এক গোমাতা হইতে গোময়, গোমূত্র ও দুধ বাহির হয়। পঞ্চগব্য তৈয়ার করিবার সময় এই ত্রিতয়েরই দরকার হয়। এই বলিয়া কি গোময়ের সঙ্গে দুধ মিশাইলে দুধের আস্বাদ পাওয়া যাইবে? যিনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, তিন সেই কুলধর্ম্মই পালন করিবেন। কাহাকেও অবহেলা করিবার বিষয় ত দেখিতে পাই না।

শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্টি ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক আমাদের রাজ-শাসনের মতই। রাজার নিকট পৌছাইতে হইলে যেমন প্রথমতঃ দ্বার-রক্ষকের নিকট গিয়া বলিতে হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের নিকট যাইতে হইলে দেবতাদের আরাধনা করিতে হয়। দেবতারা তুষ্ট না হইলে তোমাকে কোন মতেই শ্রীভগবানের নিকট যাইতে দিবে না। দ্বার-রক্ষকের অবমাননা করিলে সে তোমাকে কখনই পথ ছাড়িয়া দিবে না। দ্বার-রক্ষকের আর কোন ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, তোমাকে লাঞ্ছনা দিবার তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি :—একটী

লোক রাস্তার পার্শ্বে প্রস্রাব করিয়াছে। পাঁচ আইন অনুসারে তাহাকে কনেষ্টবল ধরিয়াছে। সে তখন বলিতে লাগিল "দোহাই মহারাণীর,—আমাকে ছাড়িয়া দেও।" তখন আমি মনে মনে বলিলাম মহারাণীর দোহাই দিলে কি হইবে? আগে কনেষ্টবল মহারাজকে সন্তুষ্ট কর।

আত্ম-সাধনা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের স্বরূপ।

তিনি পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, আনন্দময়। ঈশ্বরগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যবিষ্ঠিতম্ ॥

(গীতা ১৩শ অঃ ১৮শ শ্লোক)

সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপ-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

(গীতা ৮ম অঃ ৯ম শ্লোক)

অস্যার্থঃ—সেই পরম-জ্যোতিঃ হইতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছেন; সেই পরমজ্যোতিঃ এই তমের (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ জগতের) অতীত। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই জ্ঞানের বিষয়, এবং তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। তিনি সকল জীবেরই হৃদয়ে বেষ্টন করিয়া আছেন (এই বিষয়ে বেদবাক্য "হৃদি হ্যেষ আত্মা)।

তিনি সকলের ধাতা, তাঁহার রূপকে চিন্তা করা যায় না; তাঁহার বর্ণ আদিত্যের ন্যায় এবং তিনি এই তমের (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ জগতের) অতীত।

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সেই পরমজ্যোতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই পরমজ্যোতিঃ অতিশয় সূক্ষ্ম। তাই শ্রীভগবান ঈশ্বর গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চতৎ।

(গীতা ১৩শ অঃ ১৬শ শ্লোক)

(সূক্ষ্ম হেতু তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি নিকটেও আছেন অথচ অতি দূরে। তম-সৃষ্টির জন্যই তিনি অতি দূরে আছেন বলিয়া বোধ হয়।)

এই বিশ্বরূপ এক অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই দেখিতে পারেন নাই।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ
তেজোময়ং বিশ্বমনন্ত-মাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥
ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ।
র্ন চ ক্রিয়াভির্ণ তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যোহহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

(গীতা ১১শ অঃ ৪৭ ও ৪৮শ শ্লোক)

অর্থ ঃ—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া যোগাবলম্বন করিয়া তোমাকে যে আমার এই আদ্য ও অনন্ত তেজোময় বিশ্বরূপ দর্শন করাইলাম, সেই রূপ তোমার পূর্ব্বে আর কখন কেহ দর্শন করেন নাই। এই বিশ্বরূপ বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান কিম্বা উগ্র তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে; এই রূপ এই মনুষ্য-লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই দেখিতে পায় নাই।

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আবার সেই পরব্রহ্মের একাংশ মাত্র।

অথবা বহু-নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যামিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(গীতা ১০ম অঃ ৪১শ শ্লোক)

অস্যার্থ ঃ—অথবা, হে অর্জ্জুন! আর বেশী জানিয়া কি হইবে, এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে এই জগৎ আমার একাংশেতে স্থিত আছে।

পরব্রহ্মের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, কারণ জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, স্বয়ং অর্জ্জুনই দিব্য চক্ষুলাভ করিয়াও বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তবে তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করেন।

(গীতা ১১শ অঃ ৪৯—৫৫ শ্লোক)

জগত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব

এখন বুঝিলে ত পরব্রহ্ম কিরূপ? চল ভাই! এখন আমারা এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্বন্ধে ভাবি। আমরা যে ভূমিতে দণ্ডায়মান আছি, সেই ভূমিটী কত বড় তাহা কখনও অনুমান করিতে পারিয়াছ কি? এই পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল আছে। রাত্রিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে যে সব তারা মিট মিট করিতেছে দেখা যায়, সেই সকল তারা এই পৃথিবী হইতে কতদূরে আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা কর কি? ঐ এক একটী তারা হইতে একটী কিরণ-রেখা এই পৃথিবীতে পৌঁছাইতে হাজার হাজার বৎসর চলিয়া যায়। তোমরা মনে করিও না যে তোমরা ছাড়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন প্রাণী নাই। তোমাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ অপর জীবগণ অপরাপর লোকে বিরাজ করিতেছেন। দেবগণই শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ জীব।

সাধারণ ভাবে জীবতত্ত্ব

এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে জান? বলিতেছি শুন। সেই যে পরমজ্যোতিস্বরূপ শ্রীভগবানের খেলিবার ইচ্ছা হইল, খেলা ত একা চলে না,—তাই তিনি এইরূপ ইচ্ছা করিলেন—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতয়ম্
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজতি
ইত্যাদি।

(সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক দ্বিতীয় খণ্ড)।

অস্যার্থ ঃ—হে সৌম্য! অগ্রে (অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে) একমাত্র ও অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ব্রহ্মই ছিলেন; সেই সদ্ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিয়ছিলেন, আমি বহু হইব, আমার বহু প্রজা হউক"। এইরূপ ঈক্ষণ করিয়াই, সেই ব্রহ্মতেজের সৃষ্টি করিলেন।

উপরে যে ব্রহ্মের "ঈক্ষণ" বলা হইল, সেই ঈক্ষণ লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহা গোলমাল, ইহা লইয়া মারামারি কাটা-কাটি চলিতেছে। আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিব যে ব্রহ্মের এই "ঈক্ষণ" শক্তি হইতেই এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই "ঈক্ষণ" শক্তিকে কেহ মায়াশক্তি, কেহ মহামায়া, কেহ প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

পরব্রহ্মের যে সৃষ্টি করিবার এই ইচ্ছা, তাহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে? তিনি ত নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ। এই সৃষ্টি চালাইতে একজন লোকের ত দরকার? তাই তিনি প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা পুনরায় তপস্যা অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাদের উপরে এক এক কার্য্যের ভার দিলেন।

এই জগতের উপাদান কয়টী জান ত? এই জগতের উপাদান পাঁচটী; যথা, জল, বায়ু, মাটী, অগ্নি ও আকাশ।

এই পঞ্চভূতের আবার প্রত্যেকের এক এক গুণ আছে, যথা জলের রস, মাটীর গন্ধ, অগ্নির রূপ, বায়ুর স্পর্শ এবং আকাশের শব্দ। ইহাদিগকে পঞ্চ-তন্মাত্র বলে। ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট বাহ্যবস্তুর এই গুণগুলিকেই আনয়ন করে। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আবার এক একটী মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে, যেমন পঞ্চ পৃথিবীমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি। এক এক মণ্ডলে উপাদানের সংমিশ্রণের তারতম্য আছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে মাটীর অংশই বেশী, সূর্য্যমণ্ডলে অগ্নির অংশই বেশী এবং চন্দ্রমণ্ডলে জলের অংশই বেশী।

এখন চল ভাই! আমরা আমাদের এই পৃথিবীমণ্ডলের খবর লই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমরা শরীরধারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই শরীর উপরোক্ত পঞ্চোপাদানে গঠিত হইয়াছে। এই শরীর একটী জড় পদার্থ। ইহাকে না নাড়িলে ভগবানের খেলা হইবে কি করিয়া? তাই তিনি তাঁহার পরম-জ্যোতির একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ হৃদয়ে স্থাপন করিলেন (হৃদি হ্যেষ আত্মা)। সেই অংশটী আবার কত বড় তাহা জান কি? কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ সদৃশ সূক্ষ্ম (এষোণুরাত্মা বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য ভাগোজীব)। জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলিয়া "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং" (তিনি জীবগণের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে শাসন করেন) হইয়া শ্রীভগবানও তাহাতে আছেন। একই বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা দ্রষ্টা মাত্র কিন্তু জীবাত্মা ফলোপভোগ করেন। পরমাত্মা

জীবের কর্ম্মফলদাতা। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন তিনি সেই-রূপই ফল পাইবেন।

জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র হইলেও তিনি "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়-মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" (তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; গীতা ২য় অঃ ২৪শ শ্লোক)। তিনি চন্দনবিন্দুর ন্যায় এই দেহকে আলোকিত করেন। তবে বিশেষত্ব এই যে তিনি এই দেহসম্পর্কে কলুষিত হন। সূর্য্যকিরণ যেমন মলমূত্র-সংস্পর্শে দূষিত হয় সেইরূপ জীবাত্মাও (নিজে পরমজ্যোতিঃ শ্রীভগবানের অংশ হইয়াও) দেহসংস্পর্শে দূষিত হইয়া থাকেন। জীব নিজে ইচ্ছা করিয়া এই দেহকে ছাড়িয়া দিতে পারে না, এই দেহকে পরিষ্কার করিয়াই রাখিতে হইবে। যাঁহারা আত্মদর্শী হয়েন তাঁহারাই অনায়াসে এই দেহকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

শ্রীভগবান্ দেখিলেন যে এইরূপ করিলেও তাঁহার লীলা ভাল চলিবে না। তাই তিনি এই দেহের ভিতরে ইন্দ্রিয়-গণের সৃষ্টি করিলেন, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মুখ, হস্ত, পদ, গুহ্যদ্বার এবং লিঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি নিজেরা কোন কাজ করিতে পারে না। ইহাদের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। চক্ষুর অগ্ন্যভিমানী দেবতা, কর্ণের আকাশাভিমানী দেবতা, জিহ্বার জলাভিমানী দেবতা এবং নাসিকার বায়ুভিমানী দেবতা। এই দশ ইন্দ্রিয়ের আবার একজন রাজা আছেন, তিনি মন বলিয়া আখ্যাত হয়েন। তাঁহার স্থিতি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবস্তু আকর্ষণ করিয়া মনের নিকট আনয়ন করে। মন এই দেহেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত "আমাকে" পরিচালনা করে। প্রধানতঃ আমরা এই দেহকেই আমি বলিয়া জ্ঞান করি। এই বুদ্ধিকেই অহঙ্কার বলা হইয়া থাকে। **এই দেহেতে "আমিত্ব" জ্ঞানই বিষম মোহ।** এই মোহ দূর করিবার জন্যই সাধন ভজনের প্রয়োজন। **এই অহঙ্কার না থাকিলে শ্রীভগবানের লীলা খেলা চলিত না।**

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

(গীতা ৩য় অঃ ২৭ শ্লোক)।

এই অহঙ্কার নিয়াই জীবের প্রধানভাবে স্থিতি হয়। এই অহঙ্কার বা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মোহ দূর করিবার উপায় বলিতেছি৷

ভ্রূদ্বয় মধ্যস্থিত মনের এবং হৃৎপিণ্ডস্থিত জীবাত্মার কার্য্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি। একটী রসগোল্লা পরিপূর্ণ থালা সম্মুখে স্থাপন কর। একটীর পর একটী করিয়া রসগোল্লা খাইতে থাক। কতক্ষণ পরে দেখিবে যে জীবাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া রসগোল্লাগুলি বাহির করিয়া দিতেছেন, কিন্তু মন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আরও রসগোল্লা পেটে ঢুকাইতে চাহিতেছে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে মন আমাদিগকে কুপথে চালিত করিতেছে, হৃদয় কিন্তু তাহা করেন না। **কেবল হৃদয় বা অন্তরাত্মার দিকে চাহিয়া কার্য্য করিবে।** "মনো হৃদি নিরুধ্যচ" (মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া রাখিবে);

(গীতা ৮ম অঃ ১২শ শ্লোক)

মন ও হৃদয়ের মধ্যে যে বিচার তাহাকেই "বুদ্ধি" বলে। এই বুদ্ধিই মনুষ্যত্বের একটী প্রধান পরিচায়ক। সমস্ত কার্য্যই বুদ্ধিপূর্ব্বক করিতে হয়।

এই অহংবুদ্ধিযুক্ত আমাদিগকে কি পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয় তাহাও দেখাইতেছি।

এই শরীরটী একটী ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিনে যেমন কয়লা, জল ও অগ্নি দিতে হয়, শরীররূপ ইঞ্জিনেও সেইরূপ করিতে হয়। তবে তফাৎ এই যে শরীররূপ ইঞ্জিনে অগ্নি দিতে হয় না, তাহাতে শ্রীভগবান্ চিরদিনের জন্যই অগ্নি স্থাপন করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এখন একটু ভাবিয়া দেখ। এই শরীর যেরূপে গঠিত হইয়াছে তাহাতে যদি আমাদিগকে প্রত্যহ অগ্নি দিতে হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইত কি না? আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে কেবল কিছু কয়লারূপ অন্ন ও জল দেওয়া মাত্র। এই জল ও কয়লা যোগাইলেই আমাদের শরীর রক্ষা হইবে। শ্রীভগবান আমাদের উপর এইরূপই ভারার্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কি এই কাজটুকুও করিতে পারিব না? আমরা নিদ্রাভিভূত হইলে, এই জল কয়লাও না দিতে পারি এই আশঙ্কায় শ্রীভগবান্ ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া দেন। ক্ষুধা পাইলে কয়লা ও জল না দিয়া থাকিতে পারিব না। এই সাধারণ কার্য্যের জন্য আমরা কেন মহৎ পাপজনক কার্য্যে লিপ্ত হইব?

মনুষ্যদেহ অবিকল বৃক্ষের ন্যায়। কিন্তু ইহার একটী বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য বৃক্ষের গোঁড়া পৃথিবীর নীচদিকে

চলিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদেহরূপ বৃক্ষের গোঁড়া ঊর্দ্ধদিকে চলিয়াছে। তাই ঈশ্বরগীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং" (উপর দিকে মূল ও নিম্নদিকে শাখা)। অন্যান্য বৃক্ষের শিকড় কাটিয়া দিলে যেমন বৃক্ষটা মরিয়া যায় তদ্রূপ দেহস্থিত মস্তক কাটিয়া দিলে দেহটী মরিয়া যাইবে। এই জন্যই শ্রীভগবানের মনুষ্য-সৃষ্টি অতি চমৎকার। এই মনুষ্য-জন্ম পাইয়া যে অবহেলায় সময় কাটায় তাহার জন্মই বৃথা। এই মনুষ্যজন্মে যদি আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছাইতে না পারা যায় তবে তাহার আর কস্মিন্‌কালেও মুক্তি হইবে না।

এই দেহকে শ্রীভগবান্‌ই জানেন। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" (আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; গীতা ১৩শ অঃ ৩য় শ্লোক)। ডাক্তার কবিরাজগণ রোগী হইতে খবর লইয়া চিকিৎসা করেন, তাহারা শরীরের কিছুই জানেন না। অতএব রোগ হইলে শ্রীভগবানকেই স্মরণ করিবে। ডাক্তার কবিরাজের হাতে শরীরটী ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না।

শ্রীভগবান্ ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য মুখ্যপ্রাণরূপে নাভিদেশে অবস্থিত আছেন। এই দেহেতে পাঁচ প্রকার বায়ু আছেন, যথা, প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। ব্যান বায়ু পেটের তলদেশে থাকিয়া মলমূত্র বাহির করিয়া দেয়। প্রাণ ও অপান বায়ু ভুক্ত-দ্রব্য পাক করিয়া দেয়। সমান বায়ু শিরায় শিরায় রক্ত চালিত করিয়া দেয় এবং উদান বায়ু মস্তকের ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেয়। এই পঞ্চ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ হৃদয়স্থিত

সূক্ষ্ম আত্মা মৃত্যুকালে বাহির হইয়া যান। তখন এই দেহ-বৃক্ষটী মাত্র পড়িয়া থাকে। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়া যোগসাধনা করিলে যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারা যায়।

এই দেহের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহাকে পরিচালনা না করিলে ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। একটী হস্তকে উত্তোলন করিয়া যদি কতক দিন এক অবস্থায় রাখিয়া দেও তবে সেই হস্তটী তদবস্থায়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে।

বিশেষভাবে জীবতত্ত্ব

মৃত্যুকালে জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদিসহ এই দেহ হইতে চলিয়া যান। শরীরকে স্থূলদেহ বলা হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি সহিত জীবাত্মাকে সূক্ষ্মদেহ বলা হয়। এই সূক্ষ্মদেহকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

(গীতা ১৫শ অঃ ১০ম শ্লোক)।

অস্যার্থ ঃ—এই দেহীকে (অর্থাৎ জীবাত্মাকে) চলিয়া যাইতে, বসিয়া থাকিতে, খাইতে কিম্বা গুণযুক্ত হইয়া থাকিতে জ্ঞানচক্ষু-সম্পন্ন ব্যক্তি দেখিতে পান, কিন্তু মোহযুক্ত ব্যক্তি দেখিতে পায় না।

বিমূঢ় জীবেরই পুনর্জ্জন্ম হয়। মৃত্যুর পর তাহারা চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় তথা হইতে কিরূপে ফিরিয়া আসে তাহা বলিতেছি। "তে ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাসা ইতি জায়ন্তে"—(চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব ধান্য, যব ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাস ইত্যাদিরূপ প্রাপ্ত হয়)। "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভুয় এব ভবতি"—যে ব্যক্তি অন্ন ভক্ষণ করে, যে রেতঃ সেচন করে, জীব পুনরায় সেই অন্নও রেতোরূপ প্রাপ্ত হয়)। "যোনিমাশ্রিত্য শরীরী ভবতি" যোনিকে আশ্রয় করিয়া জীব ভোগায়তন দেহ লাভ করে। বিমূঢ়েরাই সংসারী বলিয়া আখ্যাত হয়।

জ্ঞানী বা বিদ্বান্ পুরুষের সেইরূপ উৎক্রান্তি হয় না। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (হৃদয়প্রদেশে ১০১ নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটী নাড়ী হৃদয় হইতে মূর্দ্ধার অভিমুখে গিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন)। তিনি আবার কিরূপ হইয়া থাকেন? "পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (নিজের পরংজ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরংজ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মেই লয় হন)। জ্ঞানী পুরুষই সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যাত হয়েন।

এই গেল তত্ত্বের কথা, এখন আত্মদর্শন কিরূপে করা যায় তাহা বলিতেছি।

গুরু ভিন্ন আমরা কোন কার্য্যই করিতে পারি না। আমরা

জন্মিয়াই হাটিতে শিখি নাই কিম্বা ভাত খাইতে শিখি নাই। পিতা মাতা অনেক চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে ভাত খাওয়াইতে ও হাটিতে শিখাইয়াছেন।

গুরুকরণ

গুরু অনেক প্রকারের আছেন। লেখা পড়া যাঁর নিকট শিখিয়াছি তিনিও গুরু। তবে শিক্ষাদাতা প্রভৃতিকে উপগুরু বলা যায়। প্রধান গুরু হলেন জন্মদাতা পিতা মাতা; এবং তাহার পর আধ্যাত্মিক জগতে (অর্থাৎ আত্মা, মন প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয়মূলক বিষয়ে) পোঁছাইবার যিনি কাণ্ডারী তিনি হলেন দীক্ষাগুরু। এই দীক্ষাগুরুর উপদেশ অবলম্বন করিয়া সাধন ভজন করাই হল সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কারণ এই সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় এবং দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মোহ দূর হয়। এই সাধন ভজনকেই উপাসনা বলা হয়।

গুরু হওয়া অতি সহজ, কারণ উপদেশ দিলেই গুরুগিরি হইয়া যায়। কিন্তু শিষ্য হওয়া অতি কঠিন, কারণ তাহাতে কর্ম্মের বোঝা ঘাড়ে করিয়া নিতে হয়। এই জন্যই অধুনা সকলেই গুরু হইতে চায় কিন্তু কেহই শিষ্য হইতে চায় না। এই জন্যই জনৈক মহাপুরুষ বলিয়াছেন "গুরু মিলে হাজার হাজার শিষ্য না মিলে এক।" প্রকৃত শিষ্য হইলে (অর্থাৎ কর্ম্মী হইলে) গুরুকেও উদ্ধার করিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি শুনুন। এক গুরু তাঁহার শিষ্য বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। শিষ্য অতিভক্ত; সে তাহার স্ত্রীকে গুরুর ভোগের জন্য উপদেশ দিয়া কার্য্যান্তরে বাড়ী হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। শিষ্য

বাড়ীতে কিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী তাহার উপদেশ মত কিছুই করে নাই। তখন সে রাগান্ধ হইয়া স্ত্রীকে কাটিয়া ফেলিল। বাড়ীতে লোকের হুলস্থূল পড়িয়া গেল, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির আগমন হইল। তখন 'শিষ্য একপাত্রে জল লইয়া গুরুর নিকটে গিয়া বলিল "ঠাকুর! জলে পা দেও।" শিষ্য সেই জল লইয়া স্ত্রীর গায়ে জল ছিটিয়া দিবামাত্রই স্ত্রী পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। গুরুর মনে মনে তখন অহঙ্কার হইল। তিনি নিজ বাড়ীতে গিয়া তাহার স্ত্রীর মস্তক চেছদন করিয়া নিজের পা ধুইয়া জল দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। তখন পাড়াপ্রতিবেশী আসিয়া গোলমাল উপস্থিত করিল এবং রাজপুরুষগণ আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া নিতে উদ্যত হইল। তখন সে অনন্যোপায় হইয়া বলিল যে অমুক গ্রামে আমার এক শিষ্য আছে, তাহাকে খবর দেওয়া হউক, সে আসিলে পর আপনারা যাহা করিতে হয় তাহাই করিবেন। শিষ্যকে খবর দিয়া আনা হইল। শিষ্য এই অবস্থা দেখিয়া একটী পাত্রে জল লইয়া গুরুকে বলিল "ঠাকুর! এই জলে পা দেও।" শিষ্য এই জল ছিটাইয়া দিবামাত্রই গুরুপত্নী জীবন লাভ করিলেন। তখন গুরুর মনের অহঙ্কার দূর হইল।

অধুনাতন সমাজে গুরুতা একটী ব্যবসাতে পরিণত হইয়াছে। গুরু প্রতিবৎসর শিষ্যের বাড়ী হইতে খাজানা উশল করিয়া আনিতে যান। কোন শাস্ত্রে কেহ কি এমন দেখাইতে পারিবেন যে তাহাতে বলা হইয়াছে গুরু শিষ্য বাড়ীতে

যাবেন ? শিষ্যকেই গুরুবাড়ীতে আসিতে হয়। "কলৌ বিমার্গা গতি।"

শিষ্যের কাজ গুরু করিয়া দিতে পারেন না। শিষ্যকেই কাজ করিয়া খাইতে হইবে। শাস্ত্রে আছে যে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করা মহাপাপ। গুরু ব্রহ্মস্বরূপ। কর্ম্ম না করিলে মোহবন্ধন দূর হইবে না, শুধু ব্রহ্মকে নিয়া টানাটানি করিলে কি হইবে, তিনি ত নির্ব্বিকার। সাধনভজনরূপ কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মোহ দূর করা। **কোন গুরুই শিষ্যের নিজের কাজ করিয়া দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না।**

আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা করিবার কালাকাল নাই। উপনয়নের পরই দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"। বাল্যাবস্থায় হৃদয় কোমল থাকে, সেই সময় হইতে জপতপাদি করিলে আশুফলপ্রদ হয়।

মোহবশতঃ জন্মজন্মান্তরে যে পাপ করিয়া আসিয়াছ তাহা কি সহজেই দূর হইয়া যাইতে পারে ? তোমার কর্ম্মের ফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। তবে জন্মজন্মান্তরের পাপ মোচন করিবার একটী মাত্র উপায় আছে—তাহা **সাধুসঙ্গ।** প্রকৃত সাধু কি করিয়া চিনিতে পারা যায় তাহার একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া দিতেছি। যাঁহার নিকটে গিয়া বসিলে **বাহ্য কোন বিষয়েরই উদ্রেক হয় না এবং চিত্তেতে শান্তি আসে** তাঁহাকেই প্রকৃত সাধু বলে।

এইরূপ সাধুসঙ্গ হইলেই জন্মজন্মান্তরের পাপ কাটিয়া যায়। যদি চিত্তের শান্তি না আসে তবে সেই সাধুকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিবে।

উপাসনা প্রণালী

প্রথমতঃ দেহশুদ্ধিই একান্ত প্রয়োজন। দেহটা সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই ভাল লাগে না। নিয়মিত আহার বিহারেই দেহ সুস্থ থাকে। ঈশ্বর গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

(গীতা ৬ অঃ ১৭ শ্লোক)

অস্যার্থঃ—নিয়মিতরূপে আহার ও বিহার করিলে, কর্ম্মে যত্ন করিলে এবং নিয়মিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত হইলে কর্ম্ম করিতে গিয়া যে দুঃখ হয় তাহা আর হয় না।

দেহশুদ্ধি

দেহশুদ্ধি না থাকিলে কোন কাজেই ফল পাওয়া যায় না। এই দেহসম্বন্ধ নিয়াই যত গোল। এই দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়াই লোক সকল মোহিত আছে। শ্রীবেদব্যাস বেদান্ত-

দর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ৪৭ সূত্রে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। সূত্র যথা ঃ—"অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ"—(জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও) দেহসম্বন্ধহেতুই জীবসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ বাক্য হইয়াছে। দেহশুদ্ধি না থাকিলে যে কোন কাজই করা যায় না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি। রৌদ্রে অনেকক্ষণ ভ্রমণের পর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডীকাঙ্ক্ষং সো বাহ্যাভ্যন্তরভ্যাং শুচিঃ" এই মন্ত্র জপ করিলেই কি শরীরটী শীতল হইয়া যাইবে ? তখন শরীরে পাখার বাতাস কিম্বা জল দিয়া ধৌত না করিলে দেহটী কখনই সুস্থ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ দেহের পবিত্রতা সাধন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে সব কাজই পণ্ড হইয়া যাইবে, এমন কি শরীরই রক্ষা পাইবে না।

অধুনা লোকে একেবারেই দেহশুদ্ধি করিতে চায় না। দেহটী কিছুই নয়, ইহাই প্রায় লোকের ধারণা। এই হেতুই অধুনা লোকে এত ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক বড় লোকই আহার সম্বন্ধে পাচকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পাচক মহাশয় সারারাত্রি বেশ্যাবাড়ীতে থাকিয়া স্নান না করিয়াই রন্ধনশালায় ঢুকেন এবং পাকক্রিয়া সমাধা করেন। মধ্যবিত্ত লোকদের পরিবারই অস্নাতঃ অবস্থায় শুধু কাপড় বদলাইয়া রান্না করিতে যান ; সেই রান্না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে খাওয়ান। মৈথুনক্রিয়াতে সমস্ত শরীর আলোড়িত

হয়। এই অবস্থায় স্নান না করিলে কোন প্রকারেই শরীর সুস্থ হইতে পারে না। শরীর সুস্থ না হইলে পাকক্রিয়াও সুচারুরূপে হইতে পারে না। এই হেতুই আমাদের পনর আনা রোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

দেহশুদ্ধির প্রধান উপকরণই জল ও মাটী। অধুনা অনেকেই সাবান মাখিয়া শরীর শুদ্ধ করেন। আমি বলি সাবান মাখিয়া বসিয়া থাকিলেই কি শরীর শুদ্ধ হইবে? জল দিয়া না ধুইয়া কেবল সাবান মাখিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন কি?

একজনের পরিধেয় বস্ত্র অন্যে ব্যবহার করিলে নানা সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। প্রত্যেক শরীরই বিভিন্ন, এই শরীরসংযোগ পরিত্যাগ করাকেই সঙ্গপরিত্যাগ বলে। যাঁহারা একেবারেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (অর্থাৎ সংসার ধর্ম্ম না করিয়াই বনে চলিয়া যান), তাহাদের অপর শরীরের সহিত সংযোগ হইবার আর কোন কারণই থাকে না। কিন্তু সংসারীদের তাহা হইবার যো নাই, এবং তাহা নাই বলিয়াই তাহাদের দেহশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন।

দেহশুদ্ধির আর একটী প্রধান উপায় তীর্থদর্শন। তীর্থদর্শন করিতে হইলে নানাদেশ ভ্রমণ করিতে হয় এই জন্য তীর্থভ্রমণকারীর হবিষ্যান্নই ব্যবস্থা আছে। পরিব্রাজকদেরও এইরূপ ব্যবস্থা।

এই মনুষ্যলোকে দুই প্রকার লোক আছে। এক প্রকার হলো সন্ন্যাসী, তাঁহারা অপরদেহসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ

সাংসারিক শারীরধর্ম্মমূলক কর্ম্ম ছাড়িয়া) অরণ্যে গিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করেন। **পরব্রহ্মকে চিন্তা করার নামই জ্ঞানযোগ অথবা সাংখ্যযোগ।** যদি ইহারা পুনরায় সংসারধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহারাও আত্মঘাতী হইবেন, আত্মঘাতী হইলে আর নিস্তার নাই, কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই আর তাঁহাদের থাকে না। **বৈরাগ্যই** ইহাদের প্রধান সোপান।

আর একপ্রকার লোক হলো সংসারী। এই সংসারী লোক কেবল শারীরধর্ম্মমূলক কর্ম্মই করিয়া থাকেন। ইহাদিগকেই **কর্ম্মযোগী** বলে। সংসারী লোকও সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া পরব্রহ্মকে পাইতে পারেন। ঈশ্বর গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে" (গীতা ৫ম অঃ ৫ম শ্লোক) জ্ঞানযোগ দ্বারা যাঁহাকে (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে) পাওয়া যায়, কর্ম্মযোগ দ্বারাও তাঁহাকেই পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য যথা "স খল্বেদং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (তিনি এইরূপ যাবজ্জীবন বিধানানুসারে যাপন করিয়া পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসেন না) ছান্দোগ্যোপনিষদ এইরূপ বাক্যদ্বারা সংসারী লোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন (বেদান্তদর্শন ৩ অঃ ৪ পাঃ ৪৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)। **এই সংসারী লোকের প্রধান সাধনোপায় হলো অভ্যাস।** অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিয়া

গেলেই, কর্ম্মকরিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা আর থাকে না; যেরূপ প্রথমতঃ ভাত খাইতে ও উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু সেই চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিয়া অভ্যাস জন্মিয়া গেলে আর সেইরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। অভ্যাস জন্মিয়া গেলে ভাত খাইতে খাইতে ও হাটিতে হাটিতে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা করা যায়।

সন্ন্যাসীগণকে অনেকটা "বহুস্যাং প্রজায়েয়" (প্রজা সৃষ্টি করিয়া বহু হইব) পরব্রহ্মের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে হয়। তাঁহাদের কেবল পরব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্রকার্য্য। কিন্তু সংসারী লোককে ঈশ্বরের ঐ ইচ্ছার আনুকূল্যেই চলিতে হয়। স্ত্রীগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করাই গৃহীর কর্ত্তব্য। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনং" (পুত্রোৎপাদনের জন্যই স্ত্রীগ্রহণ করিতে হয়; পিণ্ড প্রদানের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন)। ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তী হইয়া কেবল সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকিবারই একান্ত সম্ভব; এবং তাহা হইলে আত্মার মুক্তি না হইতে পারে এই আশঙ্কায়ই পুত্রোৎপাদনের প্রয়োজন। পুত্র গয়াদিতে পিণ্ড-প্রদান করিয়া আত্মার উদ্ধার সাধন করিবেন। আত্মার উদ্ধার-সাধন ভিন্ন পুত্রোৎপাদনের আর কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না।

আত্মার মুক্তিসাধনই (অর্থাৎ দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পরংজ্যোতিতে মিশিয়া যাওয়াই) সংসারী ও সন্ন্যাসী উভয় লোকেরই প্রধান

উদ্দেশ্য। আশ্রম গ্রহণ না করিয়া কেহই সমাজে থাকিতে পারিবেন না।

আত্মা (অর্থাৎ জীবাত্মা, যিনি এই দেহে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আছেন, যাহাকে চিত্ত, সত্ত্ব, চিদাত্মা, প্রত্যগাত্মা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়) অতি সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ। তিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মেরই অংশ। তিনি গুণে বিভু হইতে পারেন (অর্থাৎ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন), কিন্তু তাঁহার জগৎ সৃষ্টি করিবার কোন ক্ষমতা নাই। এই হইল জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ।

চিত্তশুদ্ধি

পূর্ব্বে দেহশুদ্ধি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এখন চিত্ত-শুদ্ধি কিরূপে করিতে হয় তাহা বলিতেছি। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, এই যে বেদবাক্য আছে তাহার বাধক শ্রুতি কুত্রাপি নাই)। এই বিষয়ে শ্রীবেদব্যাস বেদান্তদর্শনে "অবাধাচ্চ" এই সূত্র করিয়াছেন। তার পরের সূত্র "অপিচ স্মর্য্যতে" (স্মৃতি ও এইরূপেই বলেন)। স্মৃতি যথা—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" (জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষজনিত অন্নাভাব হইলে যে যেখান সেখান হইতে অন্ন

ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত পাপে লিপ্ত হয় না যেমন পদ্মপাতা জল-সংলগ্ন হয় না)। এই বলিয়া যথেচ্ছাচারী হইলে চলিবে না। সেই জন্যই শ্রীবেদব্যাস সূত্র করিলেন "শব্দাশ্চাতোঽকামকারে" ("তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না এই শ্রুতি দ্বারা যথেচ্ছাচারকে নিবৃত্ত করা হইয়াছে।

এখন আত্মশুদ্ধি কি সে হয় বুঝিলেন ? কেবল আহারের দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয়, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া বসিয়া থাকিলে আত্মশুদ্ধি হইবে না। এই আহারশুদ্ধির উপরই জাতিয়ত্ব নির্ভর করে। তাহা মৎপ্রণীত "স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। আমরা এমন সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া "আহারশুদ্ধৌ" এই বেদবাক্যকে উল্টাইয়া বলি যে আহারে কিছু আসে যায় না, কেবল মনটাকে ঠিক রাখ। মনই বা কে, আর আত্মাই বা কে, তাহার খবর কে রাখে।

আমাদের কতটুকু আহারের প্রয়োজন তাহা আমি পূর্ব্বেই দেহতত্ত্ববর্ণনাকালে বলিয়াছি। কেবল আত্মতৃপ্তিসাধনই খাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহুতর উপকরণসামগ্রী পেটে ঢুকাইলেও খাই নাই বলিয়াই বোধ হয়, কেবল কতটী ভাত পেটে ফেলিয়া দিলেই খাইয়াছি বলিয়া বোধ হয়। লোভবশবর্ত্তী হইয়াই লোকে কতকগুলি উপকরণ সামগ্রী পেটে ঢুকায়, তাহাতে তৃপ্তিসাধন নামমাত্রও না হইয়া বরঞ্চ শরীরের অনুপকারই করে। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" ইহাই শাস্ত্রের বচন। স্বভাবের রীতি

অতিক্রম করিলেই শরীরে আধি ব্যাধি আসিবে। **স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধ চলে না।** ইহা স্পষ্টই জানিয়া রাখিবে যে আহারের উপরই চিত্তের নির্ম্মলতা নির্ভর করে। চিত্তের নির্ম্মলতা না থাকিলে কোন প্রকার সদ্গুণই তোমাতে খেলিতে পারিবে না। **আহারের কোন নিয়ম নাই বলিয়াই লোকে পেটের ব্যারামে ভুগিতেছে।**

আহারশুদ্ধিবিষয়ে পঞ্জিকার ব্যবস্থা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। এই জন্য পঞ্জিকা আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য। পেটের অর্দ্ধেক ভাত দিয়া পূর্ণ করিতে হয়, চতুর্থাংশ জল দিয়া এবং বাকি চতুর্থাংশ বায়ুর ক্রিয়ার জন্য খালি রাখিয়া দিতে হয়।

"যস্মিন্ দেশে যদাচার"

মনুসংহিতায় এই বচনটী আছে। যে দেশে যে আচার তাহাই অনুসরণ করিবে। এই "আচার" শব্দ শারীরধর্ম্ম সম্বন্ধেই বিশেষরূপে প্রযোজ্য। চট্টগ্রামবাসীগণ বেশী করিয়া লঙ্কা খায়, তাহা না খাইলে তাহাদের শরীরই রক্ষা হইবে না। কিন্তু এই বলিয়া ২৪ পরগণার লোক যদি সেইরূপ লঙ্কা ব্যবহার করে তবে তাহাদের শরীরই টিকিবে না। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের (অর্থাৎ কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করিয়া যে দেশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) লোক

কখনও বঙ্গদেশে আসিতে ইচ্ছা করিতেন না, কারণ তাহাতে তাহাদের শরীর খারাপ হইয়া যাইবে। **নিজের জন্মভূমি হইতে অন্য ভুমিতে গিয়া বাস করিলে শরীরের সেইরূপ ক্ষমতাই থাকিতে পারে না।**

নিত্যক্রিয়া

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিয়া এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া স্নানান্তে দেবালয় প্রভৃতি শুদ্ধস্থানে আসন পাতিয়া বসিয়া ইষ্টদেবতার রূপের ধ্যান লইয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করার নামই উপাসনা।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

(গীতা ৭অঃ ১১শ শ্লোক।)

অস্যার্থঃ—পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করিয়া (আত্মচিন্তা করিবে)।

প্রাতে, দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যার সময় এই তিন বেলাই এইরূপ করিতে হয়। এইরূপ সন্ধ্যোপাসনাদি আমরণপর্য্যন্ত করিতে হইবে। এইরূপ জন্মজন্মান্তর তপস্যা করিলে আত্মাকে দর্শন করিতে পারা যায়। আত্মদর্শন অতি সহজ বিষয় নহে। প্রথমতঃ নিজকে চিনিতে না পারিলে সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয় না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই ত এই ব্যক্তি এত বদমায়েসী করিয়াও ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে শ্রীভগবান

গীতায় বলিয়াছেন "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং" (বহুজন্মের সাধনদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া পরে এক জন্মে পরাগতি প্রাপ্ত হয়)।

আর একটি কথা বলিয়া রাখি, কেহ কাহারও শত্রুও নয়, কেহ কাহারও মিত্রও নয়। এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ ঈশ্বর গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

(৬অঃ ৫ম শ্লোক)

অস্যার্থ ঃ—নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু।

নিজেই নিজের শত্রু কি করিয়া হয় তাহা দেখাইতেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিজ বলিতে হৃদয়স্থ জীবাত্মাকেই বুঝায়। কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা ধারণাতেই আনিতে পারে না। সচরাচর লোকে এই শরীরটাকেই আত্মা বলিয়া মনে করে এবং ইন্দ্রিয়-গণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রোধ ও লোভে অন্ধ হইয়া কার্য্য করে। ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই অপরকে শত্রু করিয়া তোলে।

প্রকৃতি বা মায়াশক্তি

পূর্ব্বে যে পরব্রহ্মের "ঈক্ষণ" শক্তি বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি বলা হয়। কেহ কেহ ইঁহার নাম মায়াশক্তি দিয়া জগৎকেই মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই প্রকৃতির আবার তিনটী গুণ আছে, যথা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই ঈশ্বর গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (এই আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অতি দুর্গমনীয়া। যে আমাকে ভজনা করে সেই এই মায়া হইতে উদ্ধার পাইবে)। পুনরায় বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে)। পরমজ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যময় পরব্রহ্মকেই পুরুষ বলা হয়। উপরোক্ত ত্রিগুণেই এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া প্রকাশ করা, রজো গুণের ক্রিয়া পরিচালনা করা এবং তমো-গুণের ক্রিয়া বিধ্বংস করা। ব্রহ্মা রজো গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (তিনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন), বিষ্ণু সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (তিনিই জগতের পালনকর্ত্তা) এবং মহেশ্বর তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা (তিনিই জগৎ ধ্বংস করিবার কর্ত্তা)। বিষ্ণু পালনকর্ত্তা বলিয়াই সর্ব্বদেবদেবীর পূজায় তাঁহাকেই অগ্রে পূজা করিতে হয়।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতির অধীন। হৃদয়স্থ আত্মা চৈতন্যময় পুরুষের অধীন।

এই ত্রিগুণ দিয়াই কালের বিভাগ হইয়াছে। তাহাতেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হইয়াছে। এই কলিকালে তমোগুণেরই প্রধান অধিকার। যদি বল যে কলির প্রভাব কি কেবল ভারতের উপরই হইয়াছে, আর অন্যত্র

হয় নাই ? তাহার উত্তরে এই বলিতেছি যে ভাল জিনিষটাই বেশী খারাপ হয়। গরমের গতিকে দুধ যেরূপ খারাপ হয় বিষ্ঠা সেরূপ হয় না। উৎকৃষ্ট ভারতই বিশেষরূপে খারাপ হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

কুলধর্ম্ম।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গীতা ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক।

অস্যার্থ ঃ—গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বিভাগ করিয়া আমি চতুর্ব্বর্ণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে) সৃষ্টি করিয়াছি। (তিনি আর নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবেন না। যার যার কর্ম্ম-দোষে অধোগতি হয়)।

পিতামহ ব্রহ্মাই পরব্রহ্মের মানসসৃষ্টি। তার পর পিতামহ ব্রহ্মা তপস্যা অবলম্বন করিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন।

আহারবিহারের উপরই জাতিধর্ম্ম নির্ভর করে, তাহা আমি আমার "স্বধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছি। এখন কুলধর্ম্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব।

পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে গিয়া প্রথমেই ঋষিদের সৃষ্টি

করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই ঋষিদের কুল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

ব্রাহ্মণ

করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই **ব্রাহ্মণত্ব** লাভ করিতে পারিবেন না। শমদমাদি গুণের উপরই ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করা আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা এক কথা নহে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কুকর্ম্মাসক্ত হয়েন তবে তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন। নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিও কুলধর্ম্ম আচরণ করিয়া গেলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন। শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা করিয়াছিলেন। গুহক তাহার কুলধর্ম্ম পালন করিয়াছিল বলিয়াই সে এইরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিল। **দেহের বিভিন্নত্বের উপরই কুলধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।** যিনি যেরূপ দেহ নিয়া যে কুলে জন্মিয়াছেন, সেই কুলোচিত খাদ্যই সেই দেহের পুষ্টিসাধন করে। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি দেবভোগ্য জিনিষ (যথা দধি, দুগ্ধ মাখম ইত্যাদি) খাইতে চায় না, কিন্তু পচা জিনিষ অতি আদরের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই পচা জিনিষই তাহার দেহের পক্ষে পুষ্টিকর।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যদি পচা জিনিষ খাইতে রুচি হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে সেই ব্যক্তির জন্মের দোষ আছে। তাহাতে নিশ্চয়ই বর্ণসাঙ্কর্য্য আছে। ব্রাহ্মণ জাতিতেই বর্ণসাঙ্কর্য্য অধিক পরিমাণে দেখা দিয়াছে। দুধ নষ্ট হইলে আর তাহা

মুখে দেওয়া যায় না। দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ-সন্তান হইতে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও সংস্কারাদি কর্ম্মে সকল বর্ণকেই যার যার মন্ত্র নিজে পাঠ করিতে হয়, কিন্তু দেবার্চ্চনাদিতে তাহা চলে না। দেবতারা ব্রাহ্মণের হাতেই পূজা গ্রহণ করেন। দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণনির্ব্বাচন করা দরকার।

যাহার বীর্য্য, সন্তান তাহারই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। জন্মদুষ্ট কুব্রাহ্মণসন্তানেরাই সকল কুকার্য্যের অগ্রণী হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ অনায়াসে অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গে সঙ্গত হইতেছে। "স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ" (দুষ্টা স্ত্রী হইলেই বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হয়, গীতা ১ম অঃ ৪০ শ্লোক)। পুরাণাদিতে এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

জন্মে যদি কোন দোষ না থাকে এবং আহারশুদ্ধি থাকে তবে সেই ব্যক্তিই খাঁটী সোনা জানিবেন।

নিম্নগামী হওয়া অতি সহজ, কিন্তু ঊর্দ্ধগামী হওয়া অতি কঠিন। ব্রাহ্মণ অতি সহজে শূদ্র হইতে পারেন। কিন্তু শূদ্রকে ব্রাহ্মণ হইতে হইলে বহু তপস্যা অবলম্বন করিতে হইবে। আমি অতি সহজে ধাঙ্গর সাজিতে পারি, কিন্তু হাই-কোর্টের জজ

হইতে অধিক বেগ পাইতে হইবে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বহু তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, শুধু পৈতা ধারণ করিয়াই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই।

ক্ষত্রিয়

দেশরক্ষার ভারই ক্ষত্রিয়ের উপর। ক্ষত্রিয়ের উপরই রাজ্য ন্যস্ত থাকে। দেশ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, রাজাই প্রথমতঃ অস্ত্রধারণ করিয়া বাহির হইবেন। শুধু রাজোপাধিভূষণে ভূষিত হইয়া হাত পা গুটাইয়া মটর গাড়ীতে চড়িয়া সুসভ্য হইয়া ক্ষত্রিয় রাজা হওয়া যায় না!

আমি কোন মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি যে, যে দিন সমস্ত রাজন্যবর্গের সমক্ষে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র নিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন, সেই দিনই উপস্থিত ঋষিমণ্ডলী এইরূপ অভিশম্পাত করিলেন যে "অদ্য হইতে ভারত ক্ষত্রিয়শূন্য হউক"। ইহারই ফলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সকল রাজাই আহুতিতে পড়িয়া গেলেন। আমি বলি "হে ঋষিসত্তমগণ! আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আর কেন, তোমাদের অভিশাপ প্রত্যাহার কর। যদি তাহা করিবার তোমাদের কোন ইচ্ছাই না থাকিত তবে বস্ত্রহরণমুহূর্ত্তেই কেন তোমাদের এই সাধের ভারতকে ভারতসাগরের অন্তঃসলিলে নিক্ষেপ করিয়া না দিলে?"

বৈশ্য

কৃষিকর্ম্মাদিই বৈশ্যের কর্ম্ম। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে ব্রাহ্মণ বিপদে পড়িলে কৃষিকার্য্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন প্রকারেই দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। এই কৃষিকর্ম্মকে

আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছি। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি তদৰ্দ্ধং রাজসেবয়া"। আমাদের সমুদ্রযান নাই, গতিকেই পরের হাত দিয়া বাণিজ্য করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাদের লভ্যাংশ অতি অল্পই হইয়া থাকে। আমরা একমণ পাটের দাম ৪।৫ টাকা পাইয়া থাকি, কিন্তু যাহারা আমাদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজে করিয়া বিদেশে যাইতেছে তাহারা সেই পাট ২০।২৫ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াই আমরা হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আমরা এখন সকলেই দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। জাত কুল মান হারাইয়া যাঁহারা বিদেশে গিয়া শিক্ষিত হইয়া আসিতেছেন তাঁহারাও এই দাসবৃত্তিই অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা যে অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষিত হইয়া আসিতেছেন সেই অর্থ দ্বারা বাণিজ্য করিলে বহু অর্থের অধিকারী হইতে পারেন; তাহা না করিয়া তাঁহারা আমাদেরই ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা এই দাসবৃত্তিতেই পরিণত হইতেছে। আমি বলি যাঁহারা জাতকুল হারাইয়া শিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা কি বাণিজ্য করিতে পারেন না? তাহাও তাঁহারা পারিবেন না, কারণ তাঁহারা আহারে বিহারে জাতিয়ত্ব হারাইয়া সর্ব্বধর্ম্মের বহির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা মোমের পুতুলের ন্যায় সুসভ্য হইয়াছেন। কোন প্রকার জীবনীশক্তিই তাঁহাদের ভিতরে নাই।

আমরা এই দাসবৃত্তিও ভাল করিয়া

করিতে পারিতেছিনা, কারণ আমরা সম্রাটের অধীনে চাকরী করিয়া আবার সম্রাটের ঘাড়ের উপরই চাপিয়া বসিতে চাই।

অতএব আমরা সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত হইয়াছি !
